কে রক্ষা পাবে?

আদিপুস্তক ৬.৯-১২পদ

এমন অনেক লোককে দেখা যায়, যারা জীবনে কখনও বাইবেল পড়েনি, কিন্তু নোহের জাহাজের কথা শুনেছে। কারণ, নোহের জাহাজের কথা বিভিন্ন গল্প বই-এ ছবিতে বা চলচ্চিত্রে পাওয়া যায়। অন্যদিকে, বন্যার সঙ্গে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মহাদেশের মানুষ বন্যার ভয়াবহ ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত। তাই, বাইবেল না পড়েও মানুষ জলপ্লাবন বা নোহের জাহাজের কথা জানে। এখন, এই জলপ্লাবন ও নোহের জাহাজ সম্বন্ধে বাইবেল বর্হির্ভূত এই পূর্বজ্ঞান আমাদের বাইবেলের সত্য উপলব্ধিতে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন করে।

আমরা জানি, ছোটরা পশু-পাখীদের গল্প শুনতে ভালোবাসে; তারা নৌকা তৈরী করতেও ভালোবাসে। এখন নোহের জাহাজের কাহিনীতে এই উভয় বিষয়ই থাকায়; ছোটদের বোধগম্য ভাষায় এই কাহিনীর বিভিন্ন সংস্করণ সর্বত্র আমাদের চোখে পড়ে। এই কাহিনী এমন বহুল পরিচিত যে আমরা এই কাহিনীকে সত্য ঘটনা নয়, নিছক পৌরাণিক গল্প বলে মনে করি। তাই, সত্য ঘটনার কথা বললেই, আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হই) *এই মহা জলপ্লাবন কি সত্যই ঘটেছিল? এর বন্যার জল কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল? এই বন্যা কি সারা পৃথিবীতে ঘটেছিল, না কেবল কয়েকটি জায়গায় ঘটেছিল? নোহের তৈরী জাহাজ কত বড় ছিল যে, তাতে সমস্ত প্রাণী প্রবেশ করেছিল? এত জল কোথা থেকে এসেছিল, আর কোথায় গিয়েছিল?*

সন্দেহপ্রবণ মানুষ যখন এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের বিষয় বেশি আগ্রহী, বাইবেল কিন্তু মোটেই এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে তেমন আগ্রহী নয়। বাইবেল মানুষের পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও তার বাস্তব রূপায়ণের দলিল; তাই, বাইবেলের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু অন্যত্র বর্তমান। এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, বাইবেলের এই কাহিনীকে ভিত্তি করে যদি কোন চলচ্চিত্র তৈরী করা যায়, তাহলে, তা হিংসা, ধ্বংস এবং সন্ত্রাসের ছবিতে রূপান্তরিত হবে। সেখানে মায়েদের কান্না, বা পশুদের হিংস্র আচরণ, বা বড় বড় অট্টালিকার পতনের ছবিই বেশি প্রাধান্য পাবে। কিন্তু, বাইবেলের বর্ণনায়, মহাজলপ্লাবনের ভয়াবহ আকার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু নয়; কিন্তু এ হল একজন মানুষ ও তার পরিবারের কাহিনী। তাই, এই ঘটনাকে বাইবেল সমগ্র পৃথিবীর এক বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসাবে নয়, কিন্তু একটি পরিবারের উদ্ধার পাবার ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে। এই কাহিনীতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, তা হল, "নোহ কেন এই মহাবিপর্যয় থেকে উদ্ধার পেয়েছিল?"

তাই, এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে, বাইবেল এমন কথা বলে শুরু করে, "***নোহের বংশ-বৃত্তান্ত এই। নোহ তৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধ লোক ছিলেন, নোহ ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন। নোহ শেম, হাম ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন***" (আদি ৬.৯-১০)। নোহের এই পরিচিতি নোহকে জলপ্লাবনের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল। বাইবেলে উল্লেখিত পরিত্রাণের ইতিহাসে নোহ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নোহের কথা আমরা বাইবেলের ৯টি বিভিন্ন পুস্তকে প্রায় ৫০বার পেয়ে থাকি। তাই, আমাদের বর্তমান জীবনে নোহের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে, স্বয়ং যীশু আমাদের বলেছেন, "***বাস্তবিক নোহের সময়ে যেরূপ হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তদ্রূপ হইবে। কারণ, জলপ্লাবনের সেই পূর্ববর্তীকালে, জাহাজে নোহের প্রবেশ দিন পর্যন্ত, লোকে যেমন ভোজন ও পান করিত, বিবাহ করিত ও বিবাহিত হইত, এবং বুঝিতে পারিল না, যাবৎ না বন্যা আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; তদ্রূপ মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে***" (মথি ২৪.৩৭-৩৯)। যীশুর এই কথার সত্যতা স্বীকার করলে, আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরাও জলপ্লাবনের পূর্বে নোহের সময়কার

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভ্রা. সুজয় রায়)

পৃথিবীতে বাস করছি। এমন সময়ে ঈশ্বরের দৃষ্টি বড় বড় শহরের প্রতি নয়, কিন্তু নোহের ন্যায় লোকদের প্রতি। শাস্ত্র বলে, ***"সদাপ্রভুর প্রতি যাহাদের অন্তঃকরণ একাগ্র, তাহাদের পক্ষে আপনাকে বলবান দেখাইবার জন্য তাঁহার চক্ষু পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করে"*** (২ বংশা ১৬.৯) । তাই, বইবেলের জলপ্লাবনের কাহিনীতে নোহই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

এখানে, নোহের পরিচয়ে ৪টি বিষয় আমাদের চোখে পরে। *প্রথমত,* নোহকে ধার্মিক বলা হয়েছে (৬.৯;৭.১)। নোহের ধার্মিকতার কথা কেবল এখানে নয়, বাইবেলের অন্যান্য অংশেও বলা হয়েছে (যিহিষ্কেল ১৪.১৪, ২০; ইব্রীয় ১১.৭; ২ পিতর ২.৫)। অনেকে এই সমস্ত অংশ পাঠ করার পর, এমন কথা বলেন, "নোহ যেহেতু সৎ ব্যক্তি ছিল, সেইহেতু ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতে মনস্থ করেছিলেন।" না, সেকথা এখানে বলা হয়নি। নোহ তার সৎকার্যের দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করেনি; কিন্তু তার ধার্মিকতার কারণে সে সৎকার্য করেছে। আর ঈশ্বর তাকে ধার্মিক করেছিলেন, কারণ সে ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করেছিল। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক এমন কথা বলেছেন, ***"বিশ্বাসে নোহ, যাহা যাহা তখন দেখা যাইতেছিল না, এমন বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভক্তিযুক্ত ভয়ে আবিষ্ট হইয়া আপন পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্মাণ করিলেন, এবং তদ্বিষয়ে জগতকে দোষী করিলেন ও আপনি বিশ্বাসানুরূপ ধার্মিকতার অধিকারী হইলেন"*** (ইব্রীয় ১১.৭)। সমগ্র বাইবেলে ঈশ্বর যখন কোন মানুষকে ধার্মিক বলেন, তা কেবল একটি কারণেই বলে থাকেন; *এই ধার্মিকতা কখনও আমাদের কার্যের ফল নয়, বা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে আমাদের চেষ্টার ফল নয়, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারা যা আমরা পাই* (ইফি ২. ৮-৯)। এই সত্য কেবল নোহ, অব্রাহাম, ইয়োব বা দানিয়েলের ক্ষেত্রে নয়, আমাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য (আদি ১৫.৬; রোমীয় ৪.৯;গালাতীয় ৩.১)। এই ধার্মিকতার কথা বলতে গিয়ে পৌল তাঁর সমস্ত জাগতিক খ্যাতিকে ক্ষতি বলে বা মলবৎ গণ্য করেছেন, যেন খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বর হইতে যে ধার্মিকতা পাওয়া যায়, তা তিনি লাভ করেন (ফিলি ৩.৮-৯)।

দ্বিতীয়ত, এখানে নোহকে তার প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে সিদ্ধ বলা হয়েছে। নোহ যে সময় এই পৃথিবীতে ছিলেন, তখন সেই পৃথিবী ছিল হিংসা, নিষ্ঠুরতা, অন্যায়, অবিচার ও ব্যভিচারে পূর্ণ। এমন পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ যখন অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা, নিরাশা, ভয়, বা অশান্তিতে ভোগে, তখন নোহ কিন্তু সকলের সামনে সিদ্ধ জীবন-যাপন করেছিল। এখন, 'ধার্মিকতা' যদি ঈশ্বরের সামনে নোহের অবস্থানকে বর্ণনা করে, তবে 'সিদ্ধতা' মানুষের সামনে নোহের আচরণকে বর্ণনা করে। প্রতিবেশি ও পরিজনদের সঙ্গে নোহ এমন জীবন-যাপন করেছিল যে, তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে পারত না। শুকনো মাটিতে জাহাজ তৈরী করতে দেখে তারা নোহকে পরিহাস করলেও, নোহের বিশ্বস্ততা বা নৈতিক-জীবন সম্বন্ধে কেউ কোনও কথা বলতে পারত না (ফিলি ২.১৫)। নোহ কীভাবে এমন জীবন-যাপন করতে পরেছিল? সে এমন জীবন-যাপন করতে পেরেছিল, কারণ সে ঈশ্বরের কাছ থেকে ধার্মিকতা পেয়েছিল। মানুষ নিজে নিজে কোন উত্তম সাধন করতে পারে না;কিন্তু ঈশ্বরের ধার্মিকতাই মানুষের দ্বারা উত্তম কার্য সাধন করে। মনে রাখতে হবে, এখানে সিদ্ধতার অর্থ 'পাপ-শূন্যতা' নয়। কারণ, যীশু খ্রীস্ট ব্যতীত আর কেউই এই পৃথিবীতে পাপশূন্য জীবন যাপন করেননি (১ পিতর ২.২২)।

তৃতীয়ত, নোহ ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন। নোহের প্রপিতামহ হনোক সম্বন্ধে বলা হয়েছিল, ***"তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন, পরে তিনি আর রহিলেন না, কারণ ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করলেন"*** (আদি ৫.২৪)। এখানে ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করার অর্থ, বিশ্বাস ও আনুগত্যের জীবন;ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের দৈনন্দিন জীবন। নোহ কেবল তার মনপরিবর্তনের দিনকে নির্দেশ করেননি;তিনি প্রত্যহ ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলেছেন। সপ্তাহের একটি মাত্র দিন বা বৎসরের বিভিন্ন উৎসবের দিন কেবল ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হওয়া নয়। জাহাজ তৈরীর প্রতিটি দিন তিনি ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়েছেন ও তাঁর সুপরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

চতুর্থত, নোহকে শেম, হাম ও যেফতের পিতা হিসাবে

বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, নোহ একটি পরিবারের প্রধান ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের বিশ্বাস করে সংসার ত্যাগ করে আশ্রমবাসী হননি। তিনি আর পাঁচ জনের মত সাধারণ জীবন যাপন করেছিলেন। বিশ্বাসী আমরা অনেক সময় এমন ভুল ধারণার অধিকারী হই যে, আমাদের সংসারিক জীবন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিকতার জীবন যাপনে বাধাস্বরূপ। কিন্তু একথা কখনও বাইবেলের শিক্ষার পরিপন্থী নয়। নোহ আমাদের কাছে সাংসারিক জীবনের পাশাপাশি ঈশ্বর বিশ্বাসের জীবনের আদর্শ রেখেছেন। পরিবারের প্রধান হিসাবে, নোহ তার ঈশ্বর-বিশ্বাস নিজের পুত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন। অধিকাংশ মানুষ জানে যে, নোহ একটা জাহাজ তৈরী করেছিল। কিন্তু তারা জানে না যে নোহ ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, তিনি একটি ধার্মিক পরিবার গড়ে তুলেছিলেন, যে পরিবারের বংশধর হয়ে অব্রাহাম, দায়ূদ বা যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। অর্থাৎ, নোহ যদিও তার সময়ের অন্যান্য মানুষের ন্যায় সাধারণ জীবন যাপন করেছিল, তথাপি তার প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে কেবল সে এবং তার পরিবার রক্ষা পেয়েছিল, করণ, সে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক ছিল, মানুষের দৃষ্টিতে সিদ্ধ ছিল এবং সে প্রত্যহ ঈশ্বরের সঙ্গে পথ চলত।

কিন্তু নোহের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, যতক্ষন না সেই সময়কার চারদিকের পরিস্থিতি আমরা উপলব্ধি করি। তাই, ১১-১২ পদে নোহের প্রজন্মের অন্যান্য মানুষের জীবনযাত্রাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ***"তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের সাক্ষাতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্মে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল।"*** এই দুই পদে, ভ্রষ্টতার কথা বারংবার বলা হয়েছে। আগত বিপর্যয়ের চিহ্ন হিসাবে প্রতিটি যুগে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আমরা একে দেখেছি। এ ছবি মানুষের সমাজের সর্বত্র আমাদের চোখে পরে। মানুষ নিজের বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টি অনুসারে, সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বর-নির্ভরশীল। সে তার জীবনের জন্য, তাঁর শ্বাসের জন্য, তার কাজের জন্য, তার বুদ্ধিমত্তার জন্য, পছন্দের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পাপে পতিত মানুষ এই সত্যকে পদে পদে অস্বীকার করতে চায়, এবং সে একাই যে সব কিছু করতে পারে, তা প্রমাণ করতে চায়। কিন্তু মানুষ যখন নিজের শক্তিতে তা করতে চায়, তখন সে সবই উল্টে ফেলে; যার ফলস্বরূপ সবই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এ সত্য আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে বারংবার দেখেছি। মানুষ আমরা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, তথা প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমাদের ধংস আনয়ন করেছি। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে মানুষের এই আচরণকে বর্ণনা করতে গিয়ে, পৌল একে ঈশ্বর কর্তৃক *"হৃদয়ের বিভিন্ন অভিলাষের অশুচিতায় সমর্পিত হওয়া"* বা *"জঘন্য রিপুর বশে সমর্পিত হওয়া"* বা *"অনুচিত কাজ করতে ভ্রষ্ট মতিতে সমর্পিত হওয়ার"* সঙ্গে তুলনা করেছেন (রোমীয় ১. ২৪, ২৬, ২৮)।

এ কথা আজ আমাদের সমাজের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। আমরাও মানুষের ক্ষমতার বড়াই করি) পারমানবিক বোমার শক্তি, সৈন্য-সামন্তের শক্তি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার শক্তি। আজ আমরা যখন ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নিজেদের বুদ্ধি ও শক্তিতে মানুষের কল্যান কামণা করছি, বাস্তবে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দৌরাত্ম ও ভ্রষ্টতাকেই প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি। আমরা কি জানি, এর দ্বারা আমরা শেষ বিচারের দিকে এগিয়ে চলেছি? সেই শেষ বিচার থেকে যদি আমরা রক্ষা পেতে চাই, আসুন নোহের কাছ থেকে শিক্ষা নিই। আমাদের সাংসারিক জীবনের মাঝে, ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়ে, মানুষের সামনে সিদ্ধ আচরণ করি ও ঈশ্বরের হাত ধরে পথ চলি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)